সাইফুল ওয়াদুদ হেলালের ‘বিশ্বাসের রঙ’
শিশির ভট্টাচার্য্য

ঐক্য আর বৈচিত্র্য জীবনের ধর্ম। এ দু’টির কোন একটিকে বাদ দিয়ে জীবন অচল। সুস্থ জীবনবোধের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রেই ঐক্য আর বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণ ঘটাবেন তার জীবনে ও মননে। এই সংমিশ্রণের প্রকৃতি মানুষে মানুষে আলাদা হবে: কতটুকু ঐক্য চাইবে মানুষ আর কতটুকু মেনে নেবে বৈচিত্র্য তা নির্ভর করবে ব্যক্তিবিশেষের মনের গঠন ও প্রকৃতির উপর। জন্মের পর মানবশিশুর মন ‘তাবুলা রাসা’ (ল্যাটিন) অর্থাৎ খালি ব্ল্যাকবোর্ড। এর পর পারিপার্শ্বিকতা যেমন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের প্রভাবে মনের ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হতে থাকে তথ্যের পর তথ্য। উত্তরকৈশোরে পৌঁছে দেখা যায়, প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব ও মননের অধিকারী। মননের একটা অংশ অবশ্যই সহজাত কিন্তু এর বেশীরভাগই অর্জিত।

প্রতিটি মানুষ আলাদা - এটা জীবনের বৈচিত্র্যের দিক। কিন্তু ‘শক-হুনদল- পাঠান- মোগল’ এক দেহ, এক জাতি - এটা জীবনের ঐক্যের দিক। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সাথে একমত হওয়া বা না হওয়া একান্তই কাকতালীয় ব্যাপার। একমত হওয়াটা একটা ঘটনা, তাই বলে না হওয়াটা কোনমতেই দুর্ঘটনা নয়। সুস্থ মনের মানুষ ভলতেয়ারের সুরে বলবে ‘আমি তোমার সাথে একমত না হতে পারি কিন্তু তোমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে আমি জীবন দেবো।’ সুস্থ সমাজ জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-জাতি-শ্রেণী নির্বিশেষে সব মানুষের মত প্রকাশে স্বাধীন পরিবেশের নিশ্চয়তা দেবে। যে ব্যক্তি বা যে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিরা বলবে, ‘ইফ য়্যু আর নট উইথ আস্, ইউ আর এগেইনস্ট আস্’ সে ব্যক্তি মৌলবাদী; সে সমাজ মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিচেছ স্বদেশে ও বিদেশে, নিজের হীন স্বার্থে।

মৌলবাদীরা জীবনের বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী নয়। তাদের মনটা এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে সেখানে অন্যের মত বা বিশ্বাসকে সম্মান করার প্রশ্নই আসে না। তাদের এই মানসিকতার পেছনে আছে দু’টি কারণ। একটি কারণ সহজাত। নিজেকে রক্ষার সহজাত তাড়না থেকেই আদিম মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হতো আর আলাদা কোন গোষ্ঠীর সদস্যকে ’দেখিবামাত্র’ হত্যা করতো। একই আদিম তাড়না আধুনিক মানুষের মনেও ক্রিয়াশীল রয়েছে বলেই সে ভিন্নমতের মানুষকে ঘৃণা করে, তাকে আক্রমণ করে নিশ্চিন্ন করতে চায়। অন্য কারণটি অর্জিত। পারিবারিক, সামাজিক, গোষ্ঠীগত ও রাষ্ট্রীয় অসুস্থ শিক্ষার কারণে মানুষ সহজাত ঘৃণাকে দমন করতে শেখে না, হয়ে উঠে মৌলবাদী। কিন্তু মানব সমাজের ইতিহাস আমাদের বলে যে মৌলবাদ কখনই সুস্থ মানসিকতা হতে পারে না। মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী। মৌলবাদ ব্যাপারটা একেবারে অযৌক্তিক। সে সব সমাজ অতীতে মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে বা এখনও দিচেছ তারা মানব জাতির ব্যাপক দুঃখকষ্টের কারণ হয়েছে। উদাহরণ: ত্রিশের দশকের জার্মানী, বিংশ শতকের আমেরিকা।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের মস্তিস্ক বিশ্বাসপ্রবণ। বিশ্বাস থাকবেই মানুষের জীবনে ও মননে এবং জীবনের বৈচিত্র্যের কারণে সে বিশ্বাস কখনই এক হবে না। বিশ্বাসের রঙ জনে জনে আলাদা। এক গোষ্ঠীর সামষ্ঠিক বিশ্বাস অন্য গোষ্ঠীর বিশ্বাসের সাথে মিলবেই এমন কোন কথা নেই। ব্যক্তিমাত্রেই চাইতে পারেন তার বিশ্বাসে অনেকে বিশ্বাসী হোন। কিন্তু তা যদি না হয় তবে তাকে ভয় দেখাতে হবে বা মেরে ফেলতে হবে এমন কোন কথা নেই। জীবনের বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই অন্যের বিশ্বাসকে মেনে নেবেন এবং নিজের বিশ্বাসে অটল থাকবেন যদি তাই তার ইচেছ হয়। কোন সুস্থ, আধুনিক সমাজ তার সদস্যদের নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেবে যদি না একের বিশ্বাস অন্যের অনিষ্টের কারণ হয়।

উপরের এই সহজ সরল কথাগুলো ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর কাছ থেকে মানুষ জেনেছে। কিন্তু জানা আর মানা দু'টি ভিন্ন ব্যাপার। অনেকে না জেনে মানে অনেকে আবার জেনেও মানে না। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মন্ট্রিয়ল চলচ্চিত্র উৎসবে সাইফুল ওয়াদুদ হেলালের ছবি বিশ্বাসের রঙে আমরা দেখি এমন এক দল মানুষকে যাদের জীবনে জানা আর মানা একাকার হয়ে গেছে। তারা বিশ্বাস করে 'যত কেলা- তত কেবলা' বা 'কেবলা তত আলা-' অথবা 'যত কেলা- তত আলা-'। তারা উদ্বাহু হয়ে নাচছে, গাইছে আর ভাবছে এতেই মিলবে হিন্দু অদ্বৈতবাদের 'কৈবল্য' বা মুসলিম সুফিবাদের 'ফানা'। তাদের চিন্তা আর বিশ্বাস সত্য না ভ্রান্ত এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ বিশ্বাস মাত্রেই অন্ধ যদিও তার রঙ আলাদা হতে পারে।

বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী - এ কথাটা মেনে নিলেই ল্যাটা চুকে যায়। ল্যাটা আমাদের চুকে কিন্তু আমাদের ল্যাটা আর মৌলবাদীদের ল্যাটা এক ল্যাটা নয়। তারা ভাবে, বৈচিত্র্য যত বেশী হবে মানব সমাজ ততই উচছন্নে যাবে; কোন বিশেষ রূপরেখা বা মডেল থাকবে না চোখের সামনে যার সাথে তুলনা করে বলা যাবে এ ঠিক, ও ভুল। সবাই ঠিক বলছে বা সবাই বলছে ভুল - এমন কি হতে পারে? না, আসলেই পারে না। বিজ্ঞানে এরকমটি হতে পারে না। ধর্মে কিন্তু পারে। ধর্ম হচেছ বিশ্বাস আর আগেই বলেছি, বিশ্বাস মাত্রেই অন্ধ। সাত অন্ধ সাত ভাবে হস্তীদর্শন করে। এর মধ্যে কোনটি ভুল, কোনটি ঠিক কার বাবার সাধ্য বলে! যে অন্ধ হাতির লেজ ধরে ভাবে হাতি দড়ির মতো চিকন সেই অন্ধই নিজের ভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে বোমা মারে অন্য এক অন্ধের উপর যে নাকি ভাবে যে হাতি কুলোর মতো চেপ্টা। হাস্যকর নয় কি? বিপদজনকও। তার চেয়ে অন্ধরা তাদের বোমাবাজি বন্ধ করুক অন্ততঃ যতদিন অন্ধত্ব নিরাময় না হয়। অবশ্য অন্ধত্ব কোনদিন নিরাময় হবার নয় কারণ আগেই বলেছি মানবমস্তিস্ক বিশ্বাসপ্রবণ। মানুষ যুক্তিবাদী। যুক্তি মানুষের চিন্তার একটি অস্ত্র কিন্তু বিশ্বাস তার প্রবণতা। প্রবণতা সহজাত বলে এর শক্তি বেশী।

হেলাল আকৈশোর চলচিচত্রবাতিকগ্রস্ত। সিনেমা তার ধ্যান-জ্ঞান। বছর পনেরো আগে বাংলাদেশে ছিলেন যখন তখনই সিনেমা আর নাটকপাড়ায় ঘোরাঘুরি করেছেন আর এক পর্যায়ে মন্ট্রিয়লে এসে জীবনযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে চলচিচত্রের, বিশেষ করে চিত্রসম্পাদনার পাঠ নিয়েছেন। ছবি দেখেন প্রচুর। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিচত্র তৈরী করেছেন দু'টি: কবি আর সুপ্রভাত মন্ট্রিয়ল। জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন সময়ে বানিয়েছেন বিজ্ঞাপন চিত্র। যাই করেছেন তাতেই রয়েছে দরদ আর শিক্ষার ছাপ। আমি মনে করি, ক্যামেরায় হেলালের হাত চমৎকার। চিত্রসম্পাদনার শিক্ষাটা যেহেতু তার আছে সেহেতু ছবি তোলার সময়ে সম্পাদনার কাজটা অনেকটাই করে রাখতে পারেন। হেলালের ক্যামেরা থাকে মানুষের সমান্তরালে। বিষয়কে উপর থেকে দেখেন না হেলাল, বিষয়ের সমান উচচতায় নামিয়ে আনেন ক্যামেরাকে, নিজেকে। ক্যামেরা সংক্রান্ত পেশায় আমার কমবেশী কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, যে সব ক্যামেরাম্যান মানুষকে ভালোবাসেন আর যারা বাসেন না তাদের ক্যামেরার কৌনিক অবস্থান বা এ্যাঙ্গেলে তফাৎ থাকে।

অনেকদিন প্রবাসজীবন কাটানোর পর ২০০৪ সালে হেলাল বাংলাদেশে গিয়েছিলেন কোন কাজে। বলা বাহুল্য, ক্যামেরা সাথে নিয়েই গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি রওয়ানা হলেন ঢাকার অদুরে বদরপুরের উদ্দেশ্যে। সেখানে প্রতি শরৎকালে বিশাল এক মেলা বসে শাহ সোলেমান বাবার মাজারে। শাহ সোলেমান লেংটা। কেউ বলেন, জীবদ্দশায় সোলেমান শাহ দিগম্বর থাকতেন তাই তাঁর নাম লেংটা। কেউ বা আবার বলেন, তিনি সব সময় লেংটি পরে থাকতেন বলেই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল লেংটা বাবা। সাধারণ লোকে বাবাকে উলঙ্গ দেখলেও জৌনপুরের পীর সাহেব নাকি বাবার শরীরে এমন এক স্বর্গীয় কাপড় জড়ানো দেখেছেন যা তিনি জীবনে কখনও দেখেননি।

লেংটা বাবার পদস্পর্শে নাকি মৃত লোক জীবিত হয়েছে। তিনি নাকি পানির উপর দিয়ে হাটতেন। হতে পারে, এসব বাবার ভক্তদের উর্বর মস্তিস্কের কল্পনার ফসল। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টওতে একই রকম সব অলৌকিক কাজ করেছেন! সেগুলোও কি লুক, জন, মথির উর্বর মস্তিস্কের কল্পনা? ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানরাতো তা মনে করেন না। লেংটার শিষ্যরাই বা করবে কেন?

লেংটা বাবার ওফাত হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু দেহত্যাগের সাথে সাথে তাঁর অলৌকিকত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অনেকেই নাকি তাঁর নামে মানত করে ফল পায়। কারও রোগ ভালো হয়। কেউ বিপদ থেকে উদ্ধার পায়। কেউ দুবাই যাবে। যাওয়ার আগে লেংটাবাবার মাজারে এসে তাঁর দোয়া নিয়ে যায়। কেউবা একটা গরু নিয়ে এলো মাজারে দেয়ার জন্যে, কেউবা দান হিসেবে দিল টাকা পয়সা। একবার মাজারে আসলেই নাকি লেংটা বাবার প্রেমে পড়ে যায় মানুষ। এক ভক্তের ভাষায়: ‘পাঁচ মিনিটও লাগে না বাবার প্রেমে পড়তে। তার পর আর না এসে থাকতে পারে না। বাংলাদেশে অনেক পীর সাহেব পার্টি করেন। আমাদের লেংটা বাবার কোন পার্ট্টি নাই। তাঁর আছে মানুষ পার্ট্টি, ভালোবাসা পার্ট্টি। বাবার শক্তি বজায় থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। আইছি লেংটা, যাইমু লেংটা; দোহাই লেংটা, দোহাই লেংটা...’।

নদীর দেশ বাংলাদেশ। জল শুধু জল। ‘দেখে দেখে চিত্ত বিকল’ হবার আগেই ইঞ্জিনের নৌকা এসে ভিড়লো বদরপুরের ঘাটে। চর এলাকার মতোই মনে হলো। লোকজন নামছে। পাড়ের কাদা মাটিতে পা পিছলে যায়। ক্লোজশটে দেখা গেল, খালি পায়ে জল পার হয়ে পাড়ে উঠে অনেকে তাদের স্যাণ্ডেল পড়ে নিচেছ। মাইকে বাজছে ‘আধুনিক ভাটিয়ালী’’র সুরে ধর্মীয় গান: ‘ও নদী, আমারে নি নিবা লেংটার বাড়ি!’ শুনেই সম্ভবতঃ হেলালের ক্যামেরা লেংটার বাড়ির পথ ধরে উঠে পড়লো এক গ্রাম্য রাস্তায়। জটাচুলদাড়িওয়ালা লাল কাপড়পড়া হিন্দু সাধুর মত চেহারা কিছু লোক এগিয়ে আসছে বাঁকানো লাঠি হাতে। দেখে হলের এক মহিলা দর্শক বলে উঠলেন: ‘ওমা এ যে দেখছি বি জে পি!’। হতে পারে তারা বাবার হিন্দু ভক্ত, হতে পারে মুসলমান। নাচতে নাচতেই এগিয়ে চলেছে অনেকে। সাথে আছে ব্যাণ্ডের বাজনা। মেলার জায়গায় গিয়ে দেখা গেল, গাছের উপরে উঠে নাচছে কেউ, কেউ বা মাটিতে। সবারই কমবেশী বাহ্যজ্ঞানরহিত।

সাত দিন ধরে চলে বাবার ওরস। লোকে লোকারণ্য। বসে যায় দোকানপাট। কি না বিক্রী হচেছ সেখানে, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্তের ছবি, মাজারের মোমবাতি, গানের ক্যাসেট...এখানে ওখানে রান্না হচেছ, যে কেউ গিয়ে পাত পেড়ে বসে পড়লেই হলো। কোন চাঁদার ব্যাপার নাকি নেই। রাতের বেলায় সঙ্গীতের তালে তালে মাজারের আঙিনায় নাচছে ভক্তরা। সেখানে নারী পুরুষ দুইই আছে। সাথে বাঁশি বাজছে, বাজছে সানাই, ঢোল। বাজাতে বাজাতে, গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে মস্তি বা ভাব এসে গেছে অনেকের। তারা আর নিজেদের মধ্যে নেই যেন। এই যে মস্তির কথা বললাম, এটা সবার ক্ষেত্রে কিন্তু নেশার বহিঃপ্রকাশ নয়। এক ভক্ত পরিষ্কার জানালেন, নেশা আর আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন জিনিষ। সাধুমহাপুরুষদের নেশায় অধিকার আছে কারণ তারা নেশাকে আধ্যাত্মিক কাজে লাগাতে পারেন। ‘আজকাল যার অধিকার নাই সেও নেশা করে। নেশার খরচ সংগ্রহের জন্য চুরি-চামারি-ছিনতাই করে। হের জন্য আমি নিজেই ঐসব ছাইড়া দিছি।’

শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত আর মারফত - ইসলামে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের এই চারটি রাস্তার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে সুফিরা ‘মারফত’কেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন কারণ এ রাস্তা ধরে গেলে নাকি সময় কম লাগে। সুফি ধর্মের উৎপত্তি ইরানে। ইরানীরা যখনই যে ধর্মের অনুসারী হয়েছে তার সাথেই মাজার, তাবিজ আর নাচগানকে জড়িয়ে নিয়েছে। ভারতবর্ষে যেহেতু ইসলাম প্রচার করেছেন সুফি আউলিয়ারা সেহেতু

এখানেও কবরপুজা আর নাচগানের ব্যাপারগুলো এসে গেছে। সুফি ধর্মের কয়েকটি শাখায় নাচকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করা হয়। নাচ এখানে বড় কথা নয়। নাচ একটি উপায়। নাচের মাধ্যমে শরীরকে দুলিয়ে দুলিয়ে মনকে বিশেষ একটি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় (বহুদিন আগে গার্ডজিয়েফ নামে এক গুরু ইওরোপীয়দের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সুফিনাচের সাথে। গার্ডিজিয়েফের উপরে একটি পুর্ণদৈর্ঘ চলচিচত্রও আছে)। ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাবার জন্যে শরীরকে ব্যবহার করার কথা তান্ত্রিক ধর্মে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে বাউল ধর্মে। নাচকে ভারতবর্ষীয় মুসলমানমানরা সাধারণতঃ বাঁকা চোখে দেখেন। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের সংস্কৃতিতেই নাচ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

বাংলাদেশে আরও একটি মাজার নাচগানের জন্য বিখ্যাত: চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার। লেংটা বাবার এক ভক্ত বললেন, সোলেমান লেংটার মাজার বাংলাদেশের দ্বিতীয় মাইজভাণ্ডার। অন্য এক ভক্ত কথাটিতে আপত্তি জানালেন: 'দ্বিতীয় মাইজভান্ডার হোক আর যাই হোক, সোলেমান লেংটাই একমাত্র বাংলাদেশের অলি। বাংলামায়ের সন্তান। অন্যরা সব অ্যারাবিয়ান। লেংটার চরণে না ছুইলে এই বাংলাদেশে কোন কাজ অইব না। লেংটার সার্টিফিকেটটা লইয়া যাইতেই অইব!' লেংটা ক্যাসেট সেন্টারের মালিক বাবার একজন ভক্ত। বছর ত্রিশেক বয়স। লেংটার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে একটা ক্যাসেট বের করেছেন তিনি। নিজের লেখা গানে নিজে সুর দিয়ে নিজেই গেয়েছেন। চমৎকার গলা। একটা গানের অন্তরা এরকম: লেংটা বাবা লেংটি পড়ে থাকতো সদা গাছের তলে রে... আর এক ভক্তের কথায় জানা গেল, ল্যাংটা বাবা নিজেও নাকি গান পছন্দ করতেন।

লেংটার মাজারে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই আসেন। আচছা বুঝলাম, অশিক্ষিত লোকেরা ধর্ম আর বেদাতের তফাৎ করতে পারে না। কিন্তু চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মলিকিউলার বায়োলজির এক তরুণ শিক্ষকেরতো তা হবার কথা নয়। 'ভক্তদের এই বিশ্বাসকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?' হেলালের এ প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক ভদ্রলোক যা বললেন তার মর্মার্থ হচেছ এই: 'আমরাতো কোরান বুঝে পড়ি না। কোরানের অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। আমরা শিক্ষিত। কিন্তু তাই বলে সোলেমান বাবার যে আধ্যাত্মিক শক্তি তাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না!' লেংটা বাবার মাজারের যারা খাদেম তাদের আত্মীয়স্বজন আছেন সুইডেনে, লন্ডনে, কানাডায়। তাদের বাড়িতে বিবিসি চলে, ইন্টারনেট আছে। হেলালের মত এই যে তাঁদের কোন মতেই বে-ওয়াকেফহাল বেওকুফ বলা যাবে না। তাদের মনে বিশ্বাস আর জ্ঞান যে চমৎকারভাবে সহাবস্থান করছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

'কেন আসেন এখানে? আপনাদের সংসার আছে, বাচচাকাচচা আছে। সব ফেলে এখানে এসে পড়ে আছেন কেন?' এই ছিল কিছু মহিলার কাছে হেলালের প্রশ্ন। 'ভালো লাগে, মনে শান্তি পাই' উত্তর দিল এক মহিলা। 'কেমন ভালো একটু বুঝাইয়া বলেন। আপনার মনে এত অশান্তিরই বা কারণ কি? 'এই মেলায় না আইসা থাকতে পারি না। কেমন ভালা লাগে কেমনে বুঝাইয়া কই! আপনার যদি কোন কিছু খাইতে ইচছা হয় আপনার যেমন সেইটা খাইলে ভালা লাগে, আমারও এই জায়গাই আইলে ভালা লাগে'। অপেক্ষাকৃত কম সচছল পরিবারের আরেক মহিলা মেলায় এসে ভক্তদের ফুটফরমাস খাটেন। রান্নায় সাহায্য করেন। এটাই ওঁর কাছে সাধনভজন। লেংটাবাবার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'রোজমজুরি চাই না বাবা; চাকরনি রাখিবা তুমি আমারে!' স্পষ্টতঃই জীবনের শেষে শাহ সোলেমান লেংটার আশীর্বাদের প্রত্যাশী তিনি।

বাঁশের কাঠামো, কাপড়ের দেয়াল, উপরে প্লাস্টিক শিটের ছাউনি, আড়াআড়ি করে আটকে দেয়া টিউব লাইট - এ রকম একটি জায়গায় বেহালা বাজিয়ে গান করছেন এক মহিলা। সাথে অবশ্যই আছে বাদকের দল। গানে ও বাদনে ভক্তিভাব সুস্পষ্ট। ভক্ত-গায়ক-বাদকদের ডিটেলস ছেড়ে এক সময় ক্যামেরা উঠে গেল আকাশে। চাঁদ

উঠেছে। দ্বিতীয়া-তৃতীয়া তিথির বাঁকা চাঁদ। সহজ সরল ইসলামের প্রতীক। ইসলামের সাথে কি সঙ্গীতের কোন বিরোধ আছে? হিন্দুস্থানের বড় বড় সঙ্গীতকারদের অনেকেই মুসলমান ছিলেন। তাদের জীবনে নামাজ ছিল, মননে ছিল কালাম। বাংলার ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ধর্ম ও সঙ্গীত দুইয়েরই চর্চা করেছেন।

গান চলছে এমন সময় এলো ঝড়। ভক্তেরা গান শুনতে শুনতেই টেনে ধরে আছেন প্যাস্টিকের প্রান্তভাগ, পাইরের বাঁশ। ভিতরে গান চলছে। বাইরে হেলালের ক্যামেরা দর্শককে দেখাচেছ বাংলার ঝড়ের রূপ: জোর ধারায় বৃষ্টি, বাতাস উথালপাতাল। বৃষ্টির আর ঝড়ের তোড় বাড়ছে। দুলছে কাপড়, দুলছে টিউবলাইট। সব বুঝি এখনি উড়ে যায়। কিন্তু না, ঝড় থেমে গেল এক সময়। গান কিন্তু থামেনি তখনও যদিও কেউ কেউ ভেজা মাটিতে সতর্ক পা ফেলে বাড়ী ফিরছে। হেলালের কামেরা এসে থামলো একজনের মুখে। প্লাস্টিক শিটের একটি প্রান্ত মাথার উপরে কোনমতে টেনে ধরে বসে আছে গানের জলসার এক প্রান্তে। মুখে অনাবিল হাসি। পরবর্তী দৃশ্যে সকাল হলো, উঠলো রোদ। রাতের আর সকালের এই দৃশ্যান্তর বড় চমৎকার। যেমন দারুণ ক্যামেরার কাজ, তেমনি সাবলীল সম্পাদনা। কোন ফিল্টার ছাড়া সহজ সুন্দর ভাবে ঝড়ের রাতের দৃশ্য চিত্রায়ণ করেছেন হেলাল। এরকম রাত দেখতে যেমন হয় তেমনই দেখাতে পেরেছেন। লাইটিঙের কেরামতি ছাড়া রাতের দৃশ্যের চিত্রায়ণ সহজ কাজ নয়, সাধারণ ভিডিও ক্যামেরাতেতো নয়ই।

হেলালের ছবির সাথে কানাডাবাসী এক পাকিস্তানী মহিলার করা অন্য একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়েছে চলচিচত্র উৎসবে: মি এন্ড মাই মস্ক। এ ছবিতে হাদিসবিশারদ আলেমরা দাবী করেছেন: হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবদ্দশায় মহিলারা পুরুষদের সাথেই নামাজ পড়তেন। সুতরাং এখন তা করতে দিতে দোষ কি? আমার কাছে এবং অন্য অনেক দর্শকের কাছে মজার ব্যাপার মনে হয়েছে এটাই যে নারীপুরুষের যে সহাবস্থানের দাবীতে এক মুসলমান নারীকে তথ্যচিত্র বানাতে হচেছ পাশ্চাত্য প্রযোজনায় (এবং প্ররোচনায় কারণ, ছবিটির একটা পরোক্ষ উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে ইসলামে নারীপুরুষের সাম্য নেই! জানি না, পরিচালক এ ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন কি না) সে সহাবস্থান লেংটা বাবার মাজারে অনেক আগে থেকেই রয়েছে, সহজ, সরল স্বাভাবিক ভাবে। হেলালের ছবিতে আমরা দেখি, নারীপুরুষ একসাথে নাচছে মাজারের আঙিনায়। কারও দৃষ্টিতে রিরংসা নেই। তার মানে এই নয় যে এসব নারীপুরুষের কোন যৌনজীবন নেই। সবই আছে তবে বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার রঙ লেগে রিরংসার রঙ ঢেকে গেছে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য। সকালবেলা দেখা যায় এক পুকুরে নারীপুরুষ একসাথে গোসল করছে। খুবই স্বাভাবিক দৃশ্য বাংলাদেশের গ্রামের, অন্ততঃ এখনও।

আমার এক বন্ধু হেলালকে জিগ্যেস করেছে 'এ ছবিতে আপনি কি বলতে চান'। হেলাল বলেছে, 'আমি যা বলতে চেয়েছি তা আমার ছবিতেই আছে।' খাঁটি কথা। ঘটনাক্রমে হেলাল বদরপুরে গিয়েছিল। যাবতীয় কারিগরী প্রতিবন্ধ মেনে নিয়ে তার নিজের দৃষ্টিকোন থেকে একটি ঘটনা সে দেখেছে এবং আমাদের কেটেছেটে নিখুঁতভাবে দেখিয়েছে। এখানে মেলাটা বড় কথা নয়, লেংটাও নিমিত্ত মাত্র। হেলালকে আমি যতটুকু চিনি, শাহ সোলেমান লেংটার অলৌকিক কেরামতিতে বিশ্বাস করার লোক তিনি নন। হেলাল একজন বৈচিত্র্যবাদী, 'মানুষ আর ভালোবাসা পার্টির সদস্য হেলাল। তিনি মনে করেন, অনেকরকম ভাবে বাঁচা সম্ভব; জীবন হতে পারে নানা রঙে রঙিন। যত বৈচিত্র্য জীবনে, তত সৌন্দর্য। আমার মনে হয়, কবিতায় যেমন রূপকের ব্যবহার হয়, মেলা আর শাহ সোলেমানও হেলালের ছবিতে ব্যবহৃত রূপক মাত্র। হেলাল আঙ্গুল তুলে চাঁদ দেখাচেছন। চাঁদের দিকে তাকাতে হবে, আঙ্গুলের দোষগুন বিচার করা পণ্ডশ্রম। কিন্তু আঙ্গুল যদি সুন্দর হয় তবে চাঁদ আর আঙ্গুল একসাথে দেখায় দোষ নেই কোন, যদি দেখার ক্ষমতা থাকে।

বিশ্বাস সহজাত বিধায় মানুষ সব সময়েই কোন না কিছুতে বিশ্বাস করবে। একশ'ভাগ খাঁটি অ-বিশ্বাসী ব্যক্তি সোনার পাথর বাটি। বিশ্বাস যেহেতু অবশ্যম্ভাবী তবে আর বোমা মেরে কি হবে। কিছু যে হয় না আফগানিস্তান, ইরাক তার প্রমাণ। বোমায় ব্যক্তির শরীর মরে, গোষ্ঠীর মনতো মরে না। তার চেয়ে কেন মানুষকে আমরা বাঁচতে দিই না তার নিজের মতো করে। কারও বিশ্বাসের রঙ আমার যদি পছন্দ নাও হয় তবুও থাকুক না সে তার বিশ্বাস নিয়ে। আমার পছন্দ হচেছ না আর কারও হতে পারে। আমার আজকে পছন্দ হচেছ না কালতো হতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তির গোষ্ঠীর বিশ্বাসতো পালটাতেও পারে! কিন্তু বিশ্বাসটিকে যদি আমরা বিকশিতই হতে না দিই তবে তা হারিয়ে যাবে বা হারিয়ে ফেলবে তার রঙ। বহুদিন আগে ঢাকা জি.পি.ও.'র এক সাধারণ নিম্নপদস্থ মুসলমান কর্মচারীকে হিন্দুদের ভারতে চলে যাওয়া নিয়ে দুঃখ করে বলতে শুনেছিলাম: 'বাবারে, শুধু এক জাতের ফুল দিয়া বাগান অয় না। অন্য সব গাছ কাইটা কাইটা বাংলাদেশে আমরা কি বাগান বানাইতাছি আল্লা মাবুদই জানেন!' এটিই হচেছ সত্যিকার বৈচিত্রবাদীর মত কথা। হেলাল ঠিক এ কথাটিই বলতে চেয়েছেন, অন্য মাধ্যমে, অন্যভাবে। পরিবেশবৈচিত্রের ব্যাপারে মানুষ সচেতন হয়েছে বছর বিশেক হলো। হেলাল মানববৈচিত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভারতীয় মহাকাব্যে মুল কাহিনীর একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া থাকে। মহাকাব্যের লেখকেরা জানতেন, কাহিনী যুগ যুগ ধরে বলা হবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই এতে যুক্ত হবে বিভিন্ন প্রক্ষিপ্ত কাহিনী কিন্তু সারসংক্ষেপটি থাকার ফলে জানা যাবে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। হেলালের ছবিতেও একটি সারসংক্ষেপ আছে এবং সেটি হচেছ বায়োস্কোপের বাকসো। ব্যাপারটা যে এখনও বাংলাদেশে আছে তা জানলাম ছবিটি দেখে। মেলায় আসা ছেলেমেয়েরা বায়োস্কোপের বাকসের ছিদ্রে চোখ দিয়ে দেখছে বিভিন্ন দৃশ্য। সাদ্দাম হোসেন, লাদেন, আফগানিস্তানে মার্কিন বোমাবাজি দিয়ে শুরু, এরপর এলো শাবনুর-শাকিল-মৌসুমীর অন্তরঙ্গ দৃশ্য এবং সব শেষে কাবা শরিফে হজের দৃশ্য এবং নামাজপড়ার আহ্বান। সব রকম বৈচিত্র্য আছে বায়োস্কোপের বাক্সে, যেমন সব থাকা উচিত মানুষের জীবনে। বাকসো থেকে চোখ সরানো এক কিশোরকে হেলাল যখন জিগ্যেস করে:'কি দেখলা কও দেখি'। ছেলেটি নিজে কিছু বলতে পারে না, সে পাশ থেকে তুলনামুলক বয়স্ক একজনের শিখিয়ে দেয়া কথা বলে যে হয়তো নিজেই বায়োস্কোপের বাকসে চোখ রাখেনি আগ্রহের অভাবে বা চোখ রাখলেও কি আর সে ছেলেটির মতো করে দেখেছে? যা দেখেছে কেমন করে তা বলবে ছেলেটি? এক পর্যায়ে পাশের এক বন্ধুকে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে ঠেলে দিয়ে ছেলেটি বলে: 'এই তুইওতো দেখছছ, তুই ক'। ওই বা কি বলবে? দার্শনিক ভিটগেনস্টাইন বলেছেন, 'যা দেখানো যায় তা বলা যায় না'।

দুই দুইবার দেখে আমি বলতে বাধ্য হচিছ যে মিরা মিডিয়ার ব্যানারে নির্মিত 'বিশ্বাসের রঙ' ছবিটি হৃদয়ের আবেগ দিয়ে করা। কারিগরী এখানে আবেগকে ছাপিয়ে উঠেনি আবার আবেগের অজুহাতে কারিগরী দিকটিকেও অবহেলা করা হয়নি। কারিগরী আর আবেগ এখানে হাত ধরাধরি করে সাবলীলভাবে এগিয়ে গেছে। ছবিটির চিত্রায়ণ ও সম্পাদনা চমৎকার। আগেও বলেছি, আবারও বললাম। হক কথার ক্ষেত্রে অধিকন্তু ন দোষায়। সাবটাইটেল দু'এক জন দর্শকের মতে অনেক জায়গায় সঠিক হয়নি। আমার কিন্তু কখনও মনে হয়নি, অনুবাদ মুল থেকে খুব একটা সরে গেছে। ছবির শেষে টাইটেল অংশে হেলাল আবার পর্দায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন ইসলামের প্রতীক বাঁকা চাঁদ। আমার খুবই ভালো লেগেছে এখানে এই প্রতীকটির পুনঃপ্রয়োগ। চাঁদ খণ্ড কেন? কেন পুর্ণ চন্দ্র নয়? আমার ব্যাখ্যা: তৃতীয়ার চাঁদ প্রতি রাতে বেড়ে পুর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। খণ্ড চাঁদের আকার বদলায়, বিশ্বাসের বদলায় রঙ। বিশ্বাসও চাঁদের মতো খণ্ডিত, জনে জনে আলাদা। সবাই বাঁচুক তার বিশ্বাস নিয়ে, বিশ্বাসের রঙ নিয়ে। রঙ পাকা হতে পারে, হতে পারে কাঁচা। কিন্তু 'হোয়াটস রঙ উইথ দি বিশ্বাস ইটসেল্ফ'

হেলালের ছবির উছিলায় মন্ট্রিয়ল ডাউনটাউনে উড়তে দেখলাম বাংলাদেশের লালসবুজ পতাকা। গর্বে মনটা ভরে গেল। মন্ট্রিয়ল চলচিচত্র উৎসবে এই নিয়ে তৃতীয় বারের মতো উড়ল বাংলাদেশের পতাকা। আমার জন্য অবশ্য এটাই প্রথম বার। আমার এই 'বাংলাদেশবাদী' ('জাতীয়তাবাদী' কথাটার মধ্যে অকারণে অন্য এক বিশ্বাসের কাঁচা রঙ লেগে গেছে বলে বিশেষণটি ব্যবহার করলাম না!) সুখানুভুতির জন্যে হেলালকে আবারও ধন্যবাদ। আশা করবো, ছবিটির বহুল প্রচার হবে, বিশ্বাসের রঙ দর্শককে অন্যের বিশ্বাস সম্পর্কে সহনশীল করে তুলবে। সমাজে মানুষের শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের জন্যে এর কোন বিকল্প নেই। 'এ যদি করা যায়, তবে বোমা মারার দরকার হবে না, প্রয়োজন হবে না যুদ্ধের।' কথাটি দর্শকদের হেলাল নিজেই বলেছেন ছবি শুরুর আগে। বাংলাদেশের ও বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হেলালের এই কথা ক'টি এবং ছবিটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। আমাদের অনেকেরই মনের 'গোপন কথাটি' হেলাল চলচিচত্রের যাবতীয় ব্যাকরণ কমবেশী মেনে, ছবির ভাষায় নিজের মতো করে বলেছেন। বাংলাদেশের তথ্যচিত্রের ইতিহাসে 'বিশ্বাসের রঙ' ছবিটির একটি বিশেষ স্থান পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।